Semester-II (General Course)

DSC-1B (CC-2): - Indian Government and Politics **Credit 06**

DSC1BT: - Indian Government and Politics

7) Social Movements : Workers, Peasants, Environmental and Women's Movement

শ্রমিকশ্রেণি: ভারতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা (Working Class: Role in Indian Politics)

ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা অনুধাবন করতে হলে আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। এ.আর. দেশাই (A.R. Desai) তাঁর *Social Background of Indian Nationalism* গ্রন্থে লিখেছেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণি ১৯১৮ সালের আগে পর্যন্ত অসচেতন ও নিষ্ক্রিয় ছিল। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল ১৯০৮ সালে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে কারারুদ্ধ করার কারণে বোম্বাই সুতাকল কর্মীদের রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট। ভারতীয় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতার লক্ষণ হিসেবে লেনিনও এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন দুর্দশা, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইত্যাদি নানা ঘটনার ফলে ১৯১৮ সালের পর ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন একটি সংগঠিত রূপ নেয়।

১৯২০ সালে এন.এম. জোশি, লালা লাজপৎ রায় এবং জোসেফ ব্যাপতিস্তার প্রয়াসের ফলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠন যেহেতু তার নিজস্ব স্বরাজের জন্য ভারতের মুক্তি তথা স্বাধীনতাকে অপরিহার্য বলে মনে করেছিল, সেহেতু তা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক শাখায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন এই শ্রমিক সংঘের ঐক্য বা সংহতি বজায় থাকল না। যখনই এই শ্রমিক সংঘের অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্ট সদস্যরা এই সংঘের নেতৃত্ব দখলের জন্য নানা ধরনের ক্রিয়াকলাপ চালনায় অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তখনই এই শ্রমিক সংঘের মধ্যে ভাঙন দানা বেঁধে উঠেছিল। ১৯২৮ সালে বোম্বাই-এর রেড ফ্ল্যাগ টেক্সটাইল ইউনিয়নের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্টরা। আর এই ঘটনাই কমিউনিস্টদের সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘ তথা এ.আই.টি.ইউ.সি-র নেতৃত্ব দখলের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই, ১৯২৯ সালে কংগ্রেস প্রভাবিত ও শাসিত শ্রমিক সংঘগুলি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি হতে ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ITUF) গঠন করেছিল। এই ঘটনায় এ.আই.টি.ইউ.সি শ্রমিক সংঘ হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পরিণতিতে, কমিউনিস্টরাও উক্ত মূল শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (T.U.C) গড়ে তুলেছিল। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট কেউই তাদের মূল সংগঠন পরিত্যাগ করে তথা সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের শ্রমিক আন্দোলনকে কার্যকররূপে পরিচালনা করতে পারেনি। তাদের উভয়ের এই বাস্তব ঘটনার অনুভূতি তাদের উভয়কেই পুনরায় মূল শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি-তে ফিরে যেতে প্রয়াসী

করেছিল। উভয়েই এ বিষয়ে পুনরায় চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছিল। অবশেষে কমিউনিস্টরা তাঁদের পৃথক সংগঠনকে বাতিল করে দিয়ে ১৯৩৫ সালে মূল শ্রমিক সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি-তে ফিরে এসেছিলেন। কংগ্রেস প্রভাবিত তথা শাসিত শ্রমিক সংঘগুলি কমিউনিস্টদের পথ অনুসরণ করল ঠিক কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়, প্রায় পাঁচ বছর পরে ফিরে এসেছিল। কিন্তু তা বেশিদিন আবার স্থায়ী হল না। কারণ, সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের যোগদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৪০ সালে বিপ্লবী কমিউনিস্ট এম.এন. রায়ের নেতৃত্বাধীনে উক্ত শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিক-কর্মচারীদের একটি অংশ নিজেদের সংগঠিত করেছিল 'ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার' (I.F.L) নামে একটি সংগঠনের ছত্রছায়ায় এবং ফ্যাসিবাদী সংগ্রামের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করেছিল। এর প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস প্রভাবিত ও শাসিত শ্রমিক সংঘগুলি পুনরায় পুরাতন মূল সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি-কে পরিত্যাগ করে নিজস্ব নতুন একটি শ্রমিক সংগঠন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (INTUC) ১৯৪৪ সালে গড়ে তুলেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের শাসিত বা প্রভাবিত শ্রমিক সংঘের গঠনের ধরনকে অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রীরাও মূল সংগঠন এ.আই.টি.ইউ.সি থেকে বের হয়ে এসে 'হিন্দ মজদুর সভা' নামে নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গঠন করেছিল। একইভাবে কিছু অতি উৎসাহী কমিউনিস্ট সদস্যও 'ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' (U.T.U.C) গঠন করেছিল। অধ্যাপক মাইরন ওয়াইনার তাঁর *The Politics of Scarcity* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "There emerged shortly after independence, four national trade union federations, each controlled by one or more political parties." অর্থাৎ এইভাবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই চারটি জাতীয় শ্রমিক সংঘ ফেডারেশন আবির্ভূত হয়েছিল। প্রতিটি এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর ভারতেও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। শ্রমিক সংঘগুলি রাজনৈতিক আদর্শ অভিমুখী হওয়ার ফলে বার বার বিভাজনের তথা ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, শ্রমিক সংঘগুলি যেমন রাজনৈতিক আদর্শ বা দর্শন অভিমুখী হয়েছে, তেমনি দেশের অগ্রগণ্য প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের শ্রমিক শাখা সংগঠনকে সহায়ক হিসাবে পেয়েছে, যেমন— জাতীয় কংগ্রেস পেয়েছে আই.এন.টি.ইউ.সি (INTUC), কমিউনিস্টরা পেয়েছে এ.আই.টি.ইউ.সি (AITUC), মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা পেয়েছে ইউ.টি.ইউ.সি, সমাজতন্ত্রীরা পেয়েছে এইচ.এম.এস এবং জনসংঘ হিন্দ্ মজদুর পরিষদকে। এই সমস্ত প্রধান প্রধান শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়নগুলি ছাড়াও আরও অসংখ্য স্থানীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত বা অরাজনৈতিক দলভুক্ত শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন আছে। ১৯৮৬ সালে ভারতের শ্রম মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী

ভারতে ৩৬,০০০ শ্রমিক সংঘ আছে। তাদের মধ্যে ৬,৫৪৩টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘগুলির মধ্যে বিরাজ করছে। কেবলমাত্র শতকরা দু'ভাগ হল কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সদস্য। যদিও নয়টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন আছে, তবুও তাদের মধ্যে চারটি সংগঠন হল রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। সেই চারটি সংগঠন বা শ্রমিকসংঘ হল, যথাক্রমে— ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC), অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC), দি হিন্দ্ মজদুর সভা (HMS) এবং ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (UTUC)। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এছাড়া আরও অনেক শ্রমিক সংঘের ফেডারেশন আছে যারা কেন্দ্রীয় শ্রমিকসংঘের অন্তর্ভুক্ত সদস্য নয়, যেমন— অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেলওয়েমেন, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কারস ইত্যাদি। দি ইনডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কারস ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি, পোর্টস অ্যান্ড ডকস হল তুলনামূলক সুসংগঠিত ও অধিকতর শক্তিশালী। এই সমস্ত অসংখ্য স্থানীয় সংগঠনগুলি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সক্রিয়।

সমগ্র দেশজুড়ে যখন শ্রমিক আন্দোলন তুঙ্গে তখন সরকার ১৯৬৬ সালে পি.বি. গজেন্দ্রগাদ্‌কারের নেতৃত্বে একটি জাতীয় শ্রম কমিশন (National Commission of Labour) গঠন করেন। কমিশন শ্রমিক সংগঠনের যৌথ দরকষাকষি (collective bargaining)-র অধিকার সুপারিশ করে এবং ধর্মঘট ও লক আউটকে যৌথ দরকষাকষির অংশ বলে স্বীকার করে। কিন্তু ধর্মঘটের অধিকারকে কিছু সীমিত করবার সুপারিশও করে। তাছাড়া শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ বিতর্ক মেটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের একটি Industrial Relations Commission গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৯৯ সালে বিজেপি চালিত এনডিএ মোর্চা আর একটি নতুন শ্রমসংক্রান্ত জাতীয় কমিশন গঠন করে।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির অন্যতম দুর্বলতা হল এর 'fragmented nature' বা বহু বিভাজিত প্রকৃতি। রাজনৈতিক দল প্রভাবিত ও অপ্রভাবিত শ্রমিকসংঘগুলি সম্পর্কে মাইরন ওয়াইনার-এর মন্তব্য হল, "There are numerous affiliated as well as unaffilliated local unions. It has ever intensified the demand for the unification of labour wings and also made the trade union movement accused of being parallel to the fragmented party system of India." অর্থাৎ রাজনৈতিক দল অনুমোদিত এবং অননুমোদিত অসংখ্য স্থানীয় ইউনিয়ন আছে। তারা তাদের শাখা সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধকরণের জন্য দাবিকে কখনোই তীব্র করে তোলেনি, বরং ভারতের খণ্ডিত রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার সমান্তরাল হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে শ্রমিকসংঘ আন্দোলনকে। অধ্যাপক হ্যারল্ড ক্রাফ্‌ও অনুরূপ মন্তব্য করে গেছেন, "For many Indian trade unionists and observers of Indian trade unionism, its worst feature is its division into four main federations and

numerous un-affiliated local unions ..."। অর্থাৎ অসংখ্য ভারতীয় শ্রমিক নেতৃবর্গের এবং ভারতীয় শ্রমিকসংঘবাদের পর্যবেক্ষকদের জন্য এর সর্বনিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য হল চারটি প্রধান ফেডারেশনে এর বিভাজন এবং অগণিত অ-প্রভাবিত স্থানীয় সংঘের সৃষ্টি।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির মাত্র নয় শতাংশ সংগঠিত; শ্রমিকশ্রেণির বাকি অংশটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত। এদেরকে বিশ্বায়নের যুগে 'foot loose labour' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। Ruddar Dutt তাঁর *Organizing the Unorganized Workers* বইতে লিখেছেন যে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনগুলি অসংগঠিত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিশেষ একটা ভাবিত নয়; বরং NGO-গুলি এদেরকে সংগঠিত করতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের ফলে পেশাগত সচলতা বা occupational mobility বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু অনিশ্চয়তা বেড়েছে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এবং বিশাল ভোটদানের শক্তিতে তাদের কৌশলগত অবস্থান থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকসংঘগুলি প্রমাণ করতে পারেনি যে, তারা এক শক্তিশালী চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থগোষ্ঠী। অধ্যাপক এস.এল. সিক্রির মতে, "The traditional trade unions are made appendages of political parties ... As such these trade unions lack functional autonomy and serve as agents of mobilization than as articulators of group demands." অর্থাৎ সনাতন সাবেকি শ্রমিকসংঘগুলি হল রাজনৈতিক দলগুলির উপাঙ্গ বা লেজ। সামগ্রিকভাবে এই শ্রমিকসংঘগুলি ক্রিয়ামূলক স্বাধিকারের অভাববোধ করে এবং গোষ্ঠী দাবিসমূহের স্পষ্ট বক্তা অপেক্ষা উপযোজনের প্রতিনিধি হিসাবে বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাঁর মতে, শ্রমিকসংঘগুলির অধিকতর মাত্রায় রাজনীতিকরণ করা হলেও তারা সাংগঠনিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ মূলধনের যোগান কম। এরা অভ্যন্তরীণ সংসক্তির বা সুসঙ্গতির এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের অভাববোধ করে থাকে। অধিকাংশ কর্মচারী বা শ্রমিক হল অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং জাতি সচেতন। তারা সর্বদাই নিয়োগকর্তার বা মালিকপক্ষের শত্রুতামূলক মনোভাবে এবং প্রতিহিংসামূলক নিপীড়নের ভয়ে ভীত। উচ্চতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রতিনিধিদের সঙ্গে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তারা কখনোই নিজেদেরকে উপযুক্ত ও স্বস্তিকর অবস্থায় আছে বলে মনে করে না, হীনম্মন্যতায় ভোগে। অধ্যাপক এস.কে. রায়ের মতানুসারে— "This weakens their bargaining strength, thus enabling a clever and determined minister to exploit divisions more easilly to impose his policy or decisions."

Scanned with CamScanner

Robert L. Hardgrave ও Stanley Kochanek তাঁদের *India: Government and Politics in a Developing Nation* বইতে লিখেছেন যে শিল্পের বিকাশের শ্লথ গতি, সংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন, অসংগঠিত শ্রমিকদের দুর্বলতা ইত্যাদির ফলে

ভারতের শ্রমিকসংঘগুলি অনেকটাই রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে; 'management' বা পরিচালন কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা রাষ্ট্রই তাদের আন্দোলনের টার্গেট। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা অত্যধিক প্রভাবিত হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধি (representatives of working class interests) অপেক্ষা দলগুলির গণসংগঠন হিসেবে (Instruments of mass mobilization) কাজ করেছে।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে INTUC রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আধিপত্যশীল শ্রমিকসংঘ রূপে কাজ করে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ১৯৭০-এর দশকে। Hardgrave ও Kochanek বলেছেন, "The 1970s marked a major shift in labour relations." ইউনিয়নগুলির শ্রমিকদের চাহিদা মেটানোর অক্ষমতা, ইউনিয়নগুলির নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সর্বোপরি শ্রমিকসংঘগুলির ওপর সরকারি দমন নীতি জন্ম দিল 'militant trade unionism' বা জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের। হরতাল ও লক আউটের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ১,০৭১, ১৯৬১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১,৩৫৭-য়, ১৯৭১ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭৫২ টিতে পৌঁছল। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই সময় 'ঘেরাও'-এর জনপ্রিয়তা খুব বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে প্রায় দুই মিলিয়ন রেল শ্রমিক রেল ধর্মঘটে শামিল হলেন। শুরু হল ইন্দিরা গান্ধী সরকারের দমন নীতি; প্রায় ৩০,০০০ রেল শ্রমিককে বন্দি করা হয়; শেষ হয় ২০ দিন ব্যাপী রেল ধর্মঘট। হার্ডগ্রেভ ও কোচানেকের ভাষায়, "It was the most serious (strike) that India has confronted." ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় হরতাল বা strike নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৮১ সালে সরকার Essential Services Maintenance Act বা ESMA জারি করে প্রতিরক্ষা, রেল, কয়লা, বিদ্যুৎ, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে স্ট্রাইক নিষিদ্ধ করে।

তাই জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর শ্রমিকদের ক্ষোভ ফেটে পড়ে। বোম্বাইয়ের দত্ত সামন্ত (Dr. Datta Samanta)-র নেতৃত্বে জঙ্গি আন্দোলন গড়ে ওঠে। বোম্বাই সুতাকলের ধর্মঘট প্রায় দু'বছর ধরে চলে— 'the longest major strike in India's industry'। কিন্তু ১৯৮৩ সালে ধর্মঘট শেষ হয় ও ড. দত্ত সামন্তের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে।

উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের প্রকোপে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। হার্ডগ্রেভ ও কোচানেকের ভাষায়, "The Indian working class has undergone a process of retrenchments, insecurity and deunionmization"। অর্থাৎ ভারতের শ্রমিকশ্রেণি ছাঁটাই, কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও ইউনিয়নের ক্রমহ্রাসমান ভূমিকার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক সংস্কার ও উদারীকরণ-পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি সাধারণভাবে রক্ষণশীল

Scanned with CamScanner

তথা আত্মরক্ষামূলক সীমিত আন্দোলনে শামিল হয়েছে। পুরোনো আক্রমণাত্মক কৌশল তথা ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদির পরিবর্তে শ্রমিক নেতৃত্বকে নতুন নতুন রক্ষণশীল ও আত্মরক্ষামূলক কৌশল ব্যবহার করতে হচ্ছে। গেট মিটিং, ধীরে চলো, 'work-to-rule', কালো ব্যাজ পরিধান, জনসভা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত নমনীয় কৌশল ব্যবহার করতে হয়েছে। তাছাড়া ধর্মঘটের অধিকার প্রসঙ্গে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার নতুন নিদান সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকৌশলে কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। কর্মহীনতা, ছাঁটাই বা বাধ্যতামূলক অবসর এবং VRS-এর মতো প্রক্রিয়া শ্রমিক সংগঠনগুলির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। কয়েকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ বাদ দিলে ভারতের বেশিরভাগ শ্রমিক সংগঠন বর্তমানে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন তথা নমনীয় উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার, চুক্তি ভিত্তিক শ্রমপ্রথা (contractual labour বা work), 'hire and fire scheme' ইত্যাদি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। Liberalisation, Privatisation ও Globalisation বা LPG মডেলের সামগ্রিক বিরোধিতা করলেও বিশ্বায়ন ও সংস্কার প্রক্রিয়ার অপ্রতিরোধ্যতাকে বাম সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছেন। M.P. Singh ও Rekha Saxena বলেছেন, "All trade unions ... have strongly opposed the neo-liberal economic reforms as anti-working class."

Unorganised Sector বা অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রসার একটি অন্যতম সমস্যা। এই ক্ষেত্রের সমস্যাগুলি হল— নিম্ন বেতন, কর্মের নিরাপত্তার অভাব, দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাজ, ছুটি ও অবসরের বিধিবদ্ধ নিয়মের অভাব ইত্যাদি। শ্রমের বিশ্বায়ন নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করছে। Gender harassment at workplace বা কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা এখন একটি বড়ো সমস্যা। সুপ্রিম কোর্ট এবিষয়ে বিশাখা নিয়মবিধি (Visakha Guidelines) প্রবর্তন করেছে অর্থাৎ মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য Gender Cell থাকা বাধ্যতামূলক। এসকল বিধিব্যবস্থা সংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের উপকৃত করলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে এর প্রভাব এখনও সীমিত।

১৯৯১ সাল থেকে পৃথিবীব্যাপী বিশ্বায়নের দাপটে ভারতেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সংকোচন ও উদারীকরণের সমর্থনে বিভিন্ন নীতি গৃহীত হতে থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও ভর্তুকি তুলে নেওয়ার ফলে শ্রমিকশ্রেণি বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। মোদী সরকারের ঘোষিত নীতিই হল 'Less Government, more Governance'। 'Downsizing' বা 'Rightsizing' of Government সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের সম্ভাবনা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস করেছে। Hardgrave ও Kochanek তাই মন্তব্য করেছেন, "Labour in India is now on the defensive, and it does not know how to respond."

Scanned with CamScanner

কৃষকশ্রেণি: ভারতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা (Peasants: Role in Indian Politics)

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, "Rural India is real India" এবং "India lives in villages." স্বাধীনতার পর প্রায় ৭০ বছর ধরে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও শিল্পায়নের কার্যক্রম নেওয়া সত্ত্বেও কৃষি ভারতের অর্থনীতির মেরুদণ্ড (Agriculture is the backbone of the Indian economy) এবং জনসাধারণের শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষ আজও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হলেও একমাত্র উচ্চবিত্ত কৃষক বা জোতদার শ্রেণি— যাদের Rudolph ও Rudolph 'bullock capitalists' আখ্যা দিয়েছেন— তাঁরা ছাড়া সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের রাজনৈতিক প্রভাব নগণ্য বললেই চলে। হার্ডগ্রেভ ও কোচানেক বলেছেন, "The largest, least mobilized and mostly unorganized sectors are the landless and near landless peasants that make up the bulk of rural households." এই ভূমিহীন দরিদ্র অসংগঠিত কৃষকরাই সংখ্যায় অধিক এবং এরা আজও দুর্দশাগ্রস্ত।

ভারতে কৃষক আন্দোলনের উৎপত্তি আলোচনা করতে গেলে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ফিরে যেতে হবে। এ.আর. দেশাই (A.R. Desai) তাঁর *Social Background of Indian Nationalism* পুস্তকে বলেছেন ১৯১৮ সালের পরে কৃষকদের রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে উঠতে থাকে, তারা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিতে শুরু করে এবং নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলে। এর আগে যে কিছু কিছু কৃষক আন্দোলন হয়েছিল সেগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, আকস্মিক, খুবই সীমিত ও স্থানীয় আকারের। স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায়ে ভারতে কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯১৭-১৮ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে বিহারে চম্পারনে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯২২ সালের মোপলা বিদ্রোহ (যদিও দুঃখজনকভাবে এর একটা সাম্প্রদায়িক দিক ছিল) ইত্যাদি। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের পর শ্রেণি হিসাবে কৃষকদের স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া গতি পায়। ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌতে প্রথম সারা ভারত কিষাণসভা মিলিত হয়। জওহরলাল নেহরু এই সভার প্রতি জোরালো সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। কংগ্রেসের উক্ত লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি সমস্যা হল আতঙ্কজনক দারিদ্র, বেকারত্ব এবং কৃষকগোষ্ঠীর ঋণগ্রস্ততা, মূলত যা সেকেলে ও উৎপীড়নকর ভূমি দখলাধিকার এবং রাজস্বব্যবস্থা এবং সম্প্রতিকালে আকস্মিকভাবে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্যে অতি মন্দাভাব তীব্র হওয়ার কারণে ঘটেছে। এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হল, অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্যবাদী শোষণের অপসারণ এবং ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং গ্রামীণ বেকার জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে রাজ্য সরকার কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃতিদান।" এর ফলেই 'অল ইন্ডিয়া কিষান কংগ্রেস' (All

Scanned with CamScanner

India Kisan Congress) জন্মলাভ করেছিল এবং কিছুদিন পরেই 'অল ইন্ডিয়া কিষান সভা' (All India Kisan Sabha) পরিণত হয়েছিল। এই কৃষক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব মূলত কংগ্রেসি নেতা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য। কারণ, তিনিই প্রথম ভারতীয় কৃষক বা চাষি সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হতে তাদের প্রকৃত সমস্যার কথা চিন্তা করে এবং কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন।

যদিও কিষান সভাগুলি ভূমি সংস্কার, জমির পুনর্বণ্টন, জমিদারি প্রথার বিলোপ ইত্যাদি দাবি করে তথাপি সেগুলি রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং তাদের ব্যবহার করা হত "primarily as instruments of political mobilization rather than as mechanisms for the articulation of agrarian interests" (Hardgrave and Kochanek)। অর্থাৎ কৃষকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে এগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত।

ড. সুভাষচন্দ্র সোমের মতে কৃষক আন্দোলন পাঁচমিশালি নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত সর্বভারতীয় কিষান সভার অধীনে ভালোভাবে শুরু করতে পারেনি। কারণ, এই সংগঠন তার মধ্যে অতি বৃহৎ কৃষক হতে শুরু করে অতি ক্ষুদ্র কৃষক পর্যন্ত সকল স্তরের কৃষককে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পরিণতিতে, এই সংগঠনের মধ্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষক স্বার্থের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বড়ো বড়ো কৃষকদের স্বার্থ মধ্যবিত্ত ও নিম্নস্তরের কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। এইভাবে ১৯৩৭ সালে সংগঠনের অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ প্রকাশ্যে দেখা দিয়েছিল। আবার কংগ্রেস দল দেশের আটটি প্রদেশে সরকার গঠনের সুযোগ পাওয়ায় তা যেন আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। এর ফলশ্রুতি হয়েছিল দুঃখজনক। কৃষক সংগঠনে ভাঙনের খেলা শুরু হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের সমাজতন্ত্রী আচার্য নরেন্দ্র দেব অল ইন্ডিয়া কিষান সভা নামে তাঁর নিজস্ব কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। গুজরাটে ইন্দুলাল যাগনিক (Indulal Yajnik) এবং বিহারে স্বামী সহজানন্দ তাঁদের নিজস্ব কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার সমস্ত কংগ্রেসি নেতৃবৃন্দকে জেলে পুরতে শুরু করেছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছিল। ভারতের কমিউনিস্টরা সেই সুযোগে সর্বভারতীয় কিষান সভার (All India Kishan Sabha) নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের ক্রিয়াকলাপে তাঁরা ব্রিটিশদের সমর্থন করতে শুরু করেছিল। উদ্দেশ্য দেশে কৃষক সম্প্রদায়কে হাত করা এবং বিদেশে জার্মানির ফ্যাসিস্ট শক্তির অগ্রগতি প্রতিরোধ করা।

স্বাধীনোত্তর ভারতেও কৃষক আন্দোলন খুব একটা শক্তিশালী বনিয়াদে গড়ে ওঠেনি। অতীতের বিশৃঙ্খলাময় ঐতিহ্য যেন তার সর্বাঙ্গের ভূষণ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং দৃষ্ট ক্ষত

Scanned with CamScanner

হয়ে ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক জোহারির ভাষায়, "The weak and almost disorganised agrarian movement in the post-independence period is a legacy of the past." অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর পর্বের দুর্বল এবং বিশৃঙ্খল কৃষক আন্দোলন হল অতীতের উত্তরাধিকার। সর্বভারতীয় কিষান সভা যেখানে সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও বিশাল জাতীয় সংগঠন হিসাবে নিজেই কৃষকদের জন্য দাবির কথা বলছে, তখন সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বা রাজ্যে ও অঞ্চলে স্থানীয় বনিয়াদের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এবং কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য লড়াই করছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া চরিতার্থের লক্ষ্যে।

স্বাধীন ভারতে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে মহারাষ্ট্রের শারদ জোশি ও পশ্চিম-উত্তরপ্রদেশের মহেন্দ্র সিং টিকায়েতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাস এঁদের ভূমিকাকে লক্ষ করে 'politicizaticm of peasnatry'র কথা বলেছেন।

রবার্ট হার্ডগ্রেভ ও স্ট্যানলি কোচানেক তাঁদের *India: Government and Politics in a Developing Nation* পুস্তকে বলেছেন গ্রামীণ ভারতে তিন ধরনের সমষ্টিগত ক্রিয়াশীলতা দেখা গেছে ("Collective action in rural India has taken three distinct forms.")। এগুলি হল:

১। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে দলভিত্তিক কিষান সভা বা সংগঠন।

২। ১৯৭০ ও ১৯৮০ দশকে কৃষক আন্দোলন এবং

৩। মাঝে মধ্যে কৃষক বিদ্রোহ।

নানা বাধা সত্ত্বেও কংগ্রেস জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করে জমির সীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন বা Land Ceiling Act পাস করা হয়। নেহরু ইচ্ছা ছিল cooperative farming বা যৌথ খামার ব্যবস্থা চালু করা কিন্তু সেটা সম্ভব না হলেও কংগ্রেস কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলত।

নেহরুজির মৃত্যু, তীব্র খাদ্য সংকট এবং বিদেশি Food Aid দানকারীদের চাপে ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি কৃষি নীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। একদিকে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী 'জয় জওয়ান জয় কিষান'-এর ডাক দেন, অন্যদিকে প্রযুক্তিনির্ভর সবুজ বিপ্লব বা Green Revolution শুরু হয়।

হার্ডগ্রেভ ও কোচানেকের মতে, ১৯৭০ ও ৮০-র দশকের কৃষক আন্দোলন ছিল এই সবুজ বিপ্লবের ফলশ্রুতি। কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের জন্য ন্যায্য দাম, ঋণ মকুব, সস্তায় বিদ্যুৎ, সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি ইত্যাদি দাবি করতে থাকে। পার্টি বা রাজনৈতিক দলভিত্তিক আন্দোলন থেকে এর স্বরূপ ছিল আলাদা। রাজেশ্বরী দেশপান্ডে একটা সমীক্ষায়

Scanned with CamScanner

দেখিয়েছেন: "The movement developed in regions that were largely benefited by the Green Revolution and commercialization of agriculture." এই সময়কার কৃষক আন্দোলনের প্রধান সংগঠনগুলি ছিল মহারাষ্ট্রের শেটকারী সংগঠন (Shetkari Sangathana), পাঞ্জাব-হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (Bharatiya Kisan Union), তামিলনাড়ুর Vivasyal Sangam, কর্ণাটকের রাজ্য রায়ত সংঘ (Rajya Ryot Sangha) প্রভৃতি।

এছাড়া ছিল কিছু কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা। Kathleen Gough-কে উদ্ধৃত করে হার্ডগ্রেভ ও কোচানেক বলেছেন, ভারতে গত দু'শতকে ৭৭টি কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে। তাই স্বাধীনোত্তর পর্বে কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা নতুন কিছু নয়। তবে এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ ও পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলন। CPI(ML) পরিচালিত নকশালবাড়ি আন্দোলন ও মাওবাদী আন্দোলন পরবর্তীকালে অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র কঠোর হাতে হিংসাশ্রয়ী নকশাল আন্দোলন দমন করতে সাময়িকভাবে সফল হলেও আজও ছত্তিশগড়, দণ্ডকারণ্য, বস্তার, জগদলপুর প্রভৃতি এলাকায় মাওবাদী আন্দোলন চলছে। একদিকে সশস্ত্র মাওবাদীদের সন্ত্রাস ও অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন— উভয়ের দ্বৈরথে সাধারণ আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন। বুকার প্রাইজ বিজয়ী লেখিকা অরুন্ধতী রায় তাঁর *Broken Republic* গ্রন্থে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্ষমতাবান মানুষের লোভ, অসাধু ব্যবসায়ীদের অরণ্যের সম্পদের ওপর কুনজর, পাশাপাশি নিরন্ন আদিবাসীদের অসহায়তা ও অনুচ্চারিত যন্ত্রণা। তাঁর মতে সহজ সরল আদিবাসীরা অরণ্যের ওপর তাদের সাবেকি অধিকার দাবি করলে রাষ্ট্র 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে তাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চালায়। তবে এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। মাওবাদী সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রীয় দমননীতি উভয়ই সমানভাবে নিন্দনীয়। বিদেশি মদতপুষ্ট মাওবাদী সন্ত্রাসকে রাষ্ট্র কখনো সমর্থন করতে পারে না; আবার একই সঙ্গে মানবাধিকারের প্রশ্নটিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। রাষ্ট্রের তরফে এখন অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে 'মাওবাদী'দের মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য।

যাই হোক হার্ডগ্রেভ ও কোচানেক এই তিন পর্যায়ের কৃষক আন্দোলন পর্যালোচনা করে বলেছেন যে ভারতের কৃষকশ্রেণির মধ্যে ঐক্যের অভাব রয়েছে। "The Indian peasanty is far from homogeneous ..." এবং এটিই এর দুর্বলতার কারণ। তবে এই বিভাজনের উৎস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে। ব্রিটিশ নিজেদের স্বার্থে নানা ধরনের কৃষক সভা তৈরি করেছিল। প্রজাস্বত্বের তারতম্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল:

Scanned with CamScanner

সাম্প্রতিক আন্দোলন: ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মহারাষ্ট্রে কৃষকরা শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘ পদযাত্রা করেন। ১২ই মার্চ ২০১৮ ভারতীয় কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। বলা হয়েছে "12th March 2018 will be remembered as red-letter day in the history of farmers' movement in Maharashtra." (People's Democracy, Octorber 07, 2018)। পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি কৃষক নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত ২০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেন AIKS মহারাষ্ট্র রাজ্য কিষান সভার নেতৃত্বে। কৃষকদের দাবির মধ্যে ছিল ঋণ মকুব, কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণ করা, Forest Right Act (FRA) কার্যকরী করা, বুলেট ট্রেন ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের ফলে কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। অদ্ভুতভাবে এই দীর্ঘ পদযাত্রা ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। বহু কৃষকের পা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরা সত্ত্বেও।

এরপর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে উত্তরপ্রদেশের কৃষকেরা গান্ধী জন্মদিবসে আন্দোলনে নামেন খোদ রাজধানীতে। 'এই সময়' সংবাদপত্রে ৮ই অক্টোবর ২০১৯ সালে মন্তব্য করা হয়: "মহারাষ্ট্রে লং মার্চটি ছিল সর্বৈব শান্তিপূর্ণ, দেশের কেন্দ্রস্থলে কৃষক বিক্ষোভ ঠিক অহিংস ভাবে সমাপ্ত হয়নি। তবে ফারাকটি যে রকমই হোক না, দুয়ের মধ্যে মিলটি তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যবৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার, সেটিতে যে কৃষি এবং কৃষকের দুর্দশা মেটেনি, সেটি এই বিক্ষোভ থেকেই স্পষ্ট। স্মর্তব্য, কৃষি-উৎপাদনের বেশির ভাগ কাঁচামালের মূল্যই ক্রমবর্ধমান। এটি সহজবোধ্য যে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির দরুণ সেই পরিস্থিতিতে কোনো বড়ো মাপের পরিবর্তনও আপাতত দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে সময়ের তফাৎ আছে। এটি অবশ্যই কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থার অন্যতম কারণ। কিন্তু সেটি অন্যতমই। সঙ্কটের মূল উৎস একটি অনড় কৃষিনীতি, যা একুশ শতকে অন্যান্য ক্ষেত্রের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম।

"কোনো একটি বিচিত্র কারণে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা কৃষিকে বাজারের সঙ্গে যুক্ত একটি পেশা হিসেবে মান্যতা দিতে দ্বিধা বোধ করে এসেছেন। এবং এখনও করছেন। ফলে বিভিন্ন উপায়ে বাজারের ওঠাপড়ার সঙ্গে কৃষকদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। রফতানির উপর নানা বাধানিষেধের দরুণ আন্তর্জাতিক বাজারের কোনো সুবিধা পায় না ভারতীয় কৃষকবৃন্দ। ফলে, ক্রমে ঘনিয়ে ওঠা সঙ্কট। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে প্রাথমিক পদক্ষেপ করতে হবে রাজ্য সরকারগুলিকেই। যথা, তেলেঙ্গানা সরকারের কৃষকদের জন্য গঠিত বিনিয়োগ তহবিল। এটির সুবিধা হল, নানাবিধ সুবিধামতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অন্যান্য রাজ্যেও কৃষিকে প্রতিযোগিতামুখী করে তোলার পদক্ষেপ করা হয়েছে। সেই পথ অনুসরণ

Scanned with CamScanner

প্রজাস্বত্বের তারতম্য

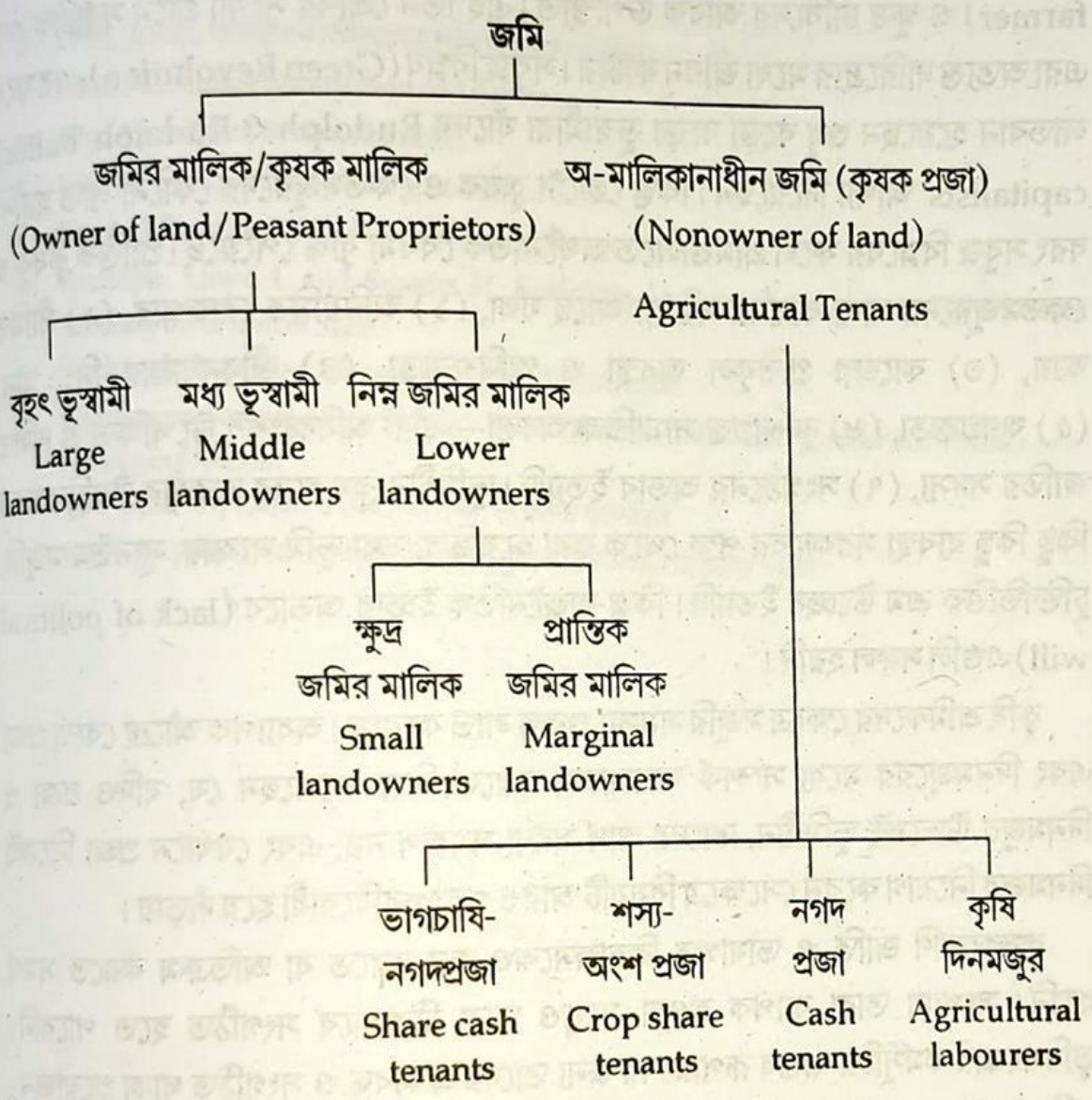

গ্রন্থসূত্র: রামানুজ গাঙ্গুলি ও সৈয়দ আবদুল হাফিজ মইনুদ্দিন, *সমকালীন ভারতীয় সমাজ*, পৃ. ৪৪৬।

করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে। দিল্লির সম্প্রতি কৃষক পদযাত্রা তারই আহ্বান। যেটিই একুশ শতকের মুক্ত অর্থনীতির দাবিও বটে।"

আগেই বলা হয়েছে ২রা অক্টোবর ২০১৮ সালে গান্ধীজির ১৪৯তম জন্মবার্ষিকীর দিনে ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের তরফে আয়োজিত 'কিষান ক্রান্তি পদযাত্রা'য় অংশ নেন দিল্লির সীমান্তে অসংখ্য কৃষক। মূলত নয় দফা দাবিতে তাঁদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলনরত কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। যে নয় দফা দাবিতে এই আন্দোলন সে সম্পর্কে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দাবি জোরালো হচ্ছিল বলে জানিয়েছেন কৃষক নেতা নরেশ টিকেত। মোদি সরকার অনেকগুলি দাবিই মেনে নিতে বাধ্য হন।

Scanned with CamScanner

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা হল ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক কৃষক (marginal farmer) ও ক্ষুদ্র চাষিদের অধিক উপস্থিতি। এই তিন শ্রেণির সংখ্যা গ্রামে সর্বাধিক এবং এরা অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটায়। সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)-এর ফলে লাভবান হয়েছেন শুধু বড়ো বড়ো ভূস্বামীরা যাঁদের Rudolph ও Rudolph 'bullock capitalists' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ছোটো কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের কোনো লাভ হয়নি। বরং সবুজ বিপ্লবের ফলে গ্রামগুলিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের নানা ধরনের সমস্যা আছে যথা, (১) অনিয়মিত রোজগার, (২) সীমিত আয়, (৩) কাজের প্রতিকূল অবস্থা ও অনিশ্চয়তা, (৪) জীবনযাত্রার নিম্ন মান, (৫) ঋণগ্রস্ততা, (৬) দুর্দশাগ্রস্ত সামাজিক অবস্থা— এঁরা অধিকাংশই উপেক্ষিত ও দলিত জাতির সদস্য, (৭) সংগঠনের অভাব ইত্যাদি। ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল, যথা ভূমি সংস্কার, ন্যূনতম মজুরি, চুক্তিভিত্তিক শ্রম উচ্ছেদ ইত্যাদি। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবে (lack of political will) এগুলি সফল হয়নি।

কৃষি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মজুরি সমস্যা গুরুত্ব লাভ করেছে। অধ্যাপক আঁন্দ্রে বেতে প্রজা এবং দিনমজুরের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যদিও প্রজা ও দিনমজুর উভয়েই ভূমিহীন, তাদের স্বার্থ সর্বদা সমরূপ নয়, এবং যেখানে প্রজা নিজেই দিনমজুর নিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে বিষয়টি আরও পরস্পরবিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

কৃষকশ্রেণি জাতি ও ভাষাগত বিভাজনকেও জয় করতে বা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি। সংখ্যায় তারা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও তারা ঠিকভাবে সংগঠিত হতে পারেনি। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত থাকা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট আমলে ১৯৭৮ সালে ভাগচাষিদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'Operation Barga' শুরু হয়। তবে এই সংস্কারেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। সবুজ বিপ্লব সম্ভ্রান্ত কৃষকদের উন্নতি বিধান করেছে ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে উৎসা পট্টনায়ক দেখিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। তাই সার্বিক চিত্রটি মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়।